‘পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে’

ছোটবেলায় আমি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবতাম। লুকিয়ে ঘর থেকে মধু নিয়ে কিছুটা চেটে চেটে খেতাম, আবার অনেক্ষণ ধরে ঠোঁটে ঘষতাম। জীবনের বেলাশেষে এসে দেখছি, আমার সে মধু-থেরাপি কাজে লাগেনি, বিষমাখা কথাই রয়ে গেছে। তাই আজীবনই অপ্রিয় সত্যকথক হয়েই রয়ে গেলাম।

কখনো মনে হয় দেশটা ‘বিষকুম্ভ’ এবং আমরা ‘বিষদিগ্ধ’ হয়ে গেছি। আশা ছিল সুসাহিত্যিক হব। জনপ্রত্যাশিত সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হব। সে গুড়ে বালি। ‘যা হয়নি বিয়ের রাত্তির, তা হবে আবার আশ্বিন-কার্তিক’! এদেশের যেদিকেই চোখ যায় বিষাদের চিহ্ন, শঠতা, হতাশা, দুরাশার দিগন্তবিস্তৃত কালোরেখা, ‘চাটার দলে’ ভরপুর; সুসাহিত্যিক হব কীভাবে! আচ্ছা, পশ্চিম দিকে নিকটেই তো ‘পলাশীর প্রান্তর’। ‘মীর জাফর আলীর দল’ কি শেষমেশ পুব দিকেই বেশি ঢুকেছিল?

কী দেখে ভালো কথা লিখবো! কিশোর বয়সেই দেশের স্বাধীনতা অর্জন দেখেছিলাম। সেদিক থেকে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান ভাবতাম, পুলকিত হতাম। স্বাধীনতাযুদ্ধের আগের কথা না বলি, তখন তো পরাধীন ছিলাম। তারপর স্বাধীন হলাম। নিজের ইচ্ছাধীন মুক্তভাবে চলতে ও সিদ্ধান্ত নিতে শিখলাম, অনন্যনির্ভর হলাম। তবুও আমাদের অবস্থা কেন এমন হলো? আমরা কেন ‘সজীব জন-গণতন্ত্র’কে কবর দিয়ে, ‘উন্নয়নের গণতন্ত্র’কে লুফে নিলাম? আমাদের পরে স্বাধীন হয়েও তো বেশ কয়েকটা দেশ ওপরে উঠে গেছে। শুধু কয়েকটা অবকাঠামো গড়াই উন্নয়নের মাপকাঠি নয়। দেশের সমস্ত নিষ্প্রাণ সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নত করার জন্য যে জনসম্পদ, এর এ হীনদশা কেন? যে জনসম্পদ অন্যান্য নিষ্প্রাণ সম্পদকে দেশের কাজে লাগাবে, তারা তো জন-আপদ হয়ে নিষ্প্রাণ সম্পদগুলোকে উল্টো কুক্ষিগত করছে। জীবনে কত দেশেই তো গেলাম। যখনই সবুজ রংয়ের এ পাসপোর্টটা হাতে দেখে, সন্দেহের তীর আমার দিকে পড়ে। চেকিংয়ে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। বুঝতে পারিনে কেন এমন করে। আমার অপরাধটা কী, কেউ বলে না। বর্তমান অবস্থায় অধিকাংশ দেশই আমাদেরকে ভালো চোখে দেখছে না, তা নির্বাচন ‘নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক’ হোক বা কৌশলী ‘সংবিধান রক্ষার নির্বাচন’ হোক। সবরকম ‘বিদেশী বন্ধু’ই তো আমাদের আছে। নিশ্চয়ই আমাদের অবর্তমানে তারা ট্যারা চোখে মুচকী হাসে, মনে মনে দীনহীন ভেবে আমাদের উপহাসের চোখে দেখে। এ উপহাসের জেরও কি আমাদের সাধারণ মানুষকেই বইতে হবে? আমরা এত ‘ঠোটকাটা’ হলাম কেন? আমার এ ‘হীনমন্যতায় ভোগা রোগ’ কি শুধুই আমার, না কি প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের? ছোটবেলায় কবিতায় পড়েছিলাম, ‘আপনারে বড় বলে বড় সে নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সে হয়।...হিতাহিত না জানিয়া মরে অহংকারে, নিজে বড় হতে চায় ছোট বলি তারে।’ ছোটবেলায় পড়া কবিতা থেকে নেওয়া শিক্ষা কি ভুলে যেতে হবে? না কি বিজ্ঞাপন দিয়ে জিব ঘুরিয়ে যে বড় বড় কথা বলে, তাকে বড় বলতে হবে? আমরা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারে দেশের স্বার্থকে বিকিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করিনে কেন? আমি কি নিজেকে অতিরিক্ত বুদ্ধিমান ভেবে ঠোঁটে মধু ঘষে মধুভাষী হতে পেরেছি? ব্রিটিশ ও পশ্চিম-পাকিস্তান আমাদের শোষণ করেছে, আমরা তা জানি। এই বায়ান্ন বছর ধরে নিজেদের মানুষ দিয়েই কি আমরা কম শোষিত হচ্ছি? যত দিন যাচ্ছে, শোষণের মাত্রা বাড়ছে, ধরন ও রূপ পাল্টাচ্ছে। অনন্য প্রতারক, নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী, দুর্নীতিবাজ, জোচ্চোর, ক্লাউনে ক্রমেই দেশ ভরে যাচ্ছে। কথায় বলে, ‘বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে পেলাম কাছে’। এখন কোথায় যাব? একটা দেশের মানবসম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে তাদের আর থাকে কী!

একদিনের যুগান্তরের কয়েকটা খবর উল্লেখ করি (১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩): ‘সামগ্রীক অর্থনীতির ওপর বড় আঘাত– বাংলাদেশ থেকে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি বাড়ছে, কিন্তু এরপরও কমে যাচ্ছে রেমিট্যান্স প্রবাহ’। ‘মূল্যস্ফীতির

অসহনীয় ঊর্ধ্বগতিতে বিশিষ্ট ২৪ নাগরিকের উদ্বেগ।' 'মেঘনায় আ.লীগের দুগ্রুপের সংঘর্ষে নিহত ১ আহত ১০।' 'দিশেহারা মানুষ যাবে কোথায়? –সংকট, সংকট আর সংকট। সার্বিক সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে জনগণ। যারা এ সংকট থেকে জনগণকে উদ্ধার করতে পারেন, তাদের এ বিষয়ে মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। ক্ষমতাসীনদের মাথাব্যথা একটাই– কিভাবে নির্বাচনের দুয়ার অতিক্রম করে ক্ষমতায় টিকে থাকা যাবে। ক্ষমতার বাইরে যারা আছেন, তাদেরও একই চিন্তাভাবনা– কীভাবে ক্ষমতার মসনদে বসা যাবে। জনগণের কল্যাণের বিষয়টি রাজনীতিকদের মাথায় নেই।'

এই খবরগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে জায়গা সংকুলান হবে না। ভাসা ভাসা কিছু বলি। মিথ্যার বেসাতি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, দলবাজী সেই স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে লেগেই আছে। কখনো কখনো কমবেশি হয়েছে মাত্র। এই সবকিছুর মূলে বিকৃত মানসিকতার রাজনীতি। আমরা রাজনৈতিক দলের গুরুরা ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়ের হাতে রামদা-কিরিচ তুলে দিয়েছি। দলে-দলে দ্বন্দ্ব, ভাইয়ে-ভাইয়ে মারামারি-কোন্দল, একই দলে অর্ন্তদ্বন্দ্ব বহাল রয়েছে। যার যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। আইনের শাসন নেই। নানাধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেশটা ভরে গেছে, কিন্তু (ব্যতিক্রম বাদে) কোথাও সুশিক্ষা নেই। সামাজিক শান্তির পরিবেশ কোথায়? তৃণমূল পর্যন্ত ঘরে ঘরে রাজনৈতিক সংঘাত জিইয়ে রেখেছি। শিক্ষার মান যারপরনাই নীচে নামিয়েছি (মাস্টার হওয়াতে যা স্বচোক্ষে দেখছি)। এদেশে যত রাজনৈতিক দল আছে, বিশ্বের আর কি কোথাও তা আছে? গ্রাম-গঞ্জের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেছি। দুর্নীতি, মাদক, লুটপাটের প্রকাশ্য আসর বসেছে। জীবনের প্রতিটি পদে পদে টাউট, বাটপার, প্রতারকে ছেয়ে গেছে। সমাজ থেকে সুশিক্ষা, মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, বিশ্বাস উঠে গেছে। রাজনীতির নামে প্রতিহিংসা শেখাচ্ছি, অপশিক্ষা-কুশিক্ষার বীজ বুনছি, হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছি, আবার মুখে আশার বুলি আওড়াচ্ছি, 'ময়না পড়রে জাদুর ধন, কাল সকালে ফড়িং মেরে দেবো বারো পণ, ময়না পড়রে...।' এসবই আমাদের আত্মপ্রবঞ্চণা। কোনো রাজনীতিক আমার দিকে হেই হেই করে তেড়ে আসার প্রয়োজন নেই; আত্মজিজ্ঞাসা কোথায়? নিষ্পেষিত, নিপীড়িত লক্ষ মানুষের বুকফাটা কান্না ও আহাজারি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ বলেও তো একটা কথা আছে। সাধারণ মানুষ প্রতিশোধ না নিলেও হয়তো প্রকৃতির প্রতিশোধ কেউ রোধ করতে পারবে না। যে যা-ই বলুক আমাদের আত্মশুদ্ধির সময় এসেছে।

এত সুন্দর একটা দেশ। এদেশের মাটির গুণের তুলনা নেই। মনের অজান্তেই কোথাও কোনো একটা বীজ পড়ে থাকলে তা অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং কোনো এক সময়ে কচি-পল্লবে ভরে যায়। শাশ্বত অতিথিপরায়ণ ও সহজ-সরল বাঙালির আজ এ কী দশা! স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও তো এরা আত্মত্যাগী, দেশপ্রেমী ছিল। এদের মাথায় এত জটিলতা-কুটিলতা কে কখন ঢুকালো? শুনতে খারাপ লাগলেও বলতেই হবে: এদেশের এই দিগভ্রষ্ট-কুলনাশী কুটিল রাজনীতি সব নষ্টের জননী।

এদেশ জনসংখ্যাধিক্যের দেশ। মধ্যপ্রাচ্যসহ পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশই জনশক্তি সংকটে ভুগছে। আমাদের এ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে বিদেশে পাঠালেই আর্থিক সংকটের চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যায়। আমরা যুব সমাজের ক'জনকে সম্পদ তৈরি করে আয়-রোজগারের জন্য বিদেশ পাঠাচ্ছি? অধিকাংশ পাঠাচ্ছি উটের রাখাল কিংবা দিনমজুর হয়ে কাজ করার জন্য। রেমিট্যান্স বেশি আসবে কীভাবে? আমাদের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা কোথায়? কাগজে-কলমে যদি কিছু থেকেও থাকে, সে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আদৌ আছে কী? দিন পেরোতে পেরোতে বছর, বছর পেরোতে পেরোতে বায়ান্নটা বছর পেরিয়ে গেছে। প্রাইমারি, হাইস্কুল ও কলেজে যে লেখাপড়া আমরা শেখাচ্ছি, আগামী দশ-পনেরো বছরেও শিক্ষার মানের কোনো উন্নতি হওয়ার আশা নেই, যদি শিক্ষাব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন না করা হয়। আবার সকল সেক্টর দুর্নীতিযুক্ত রেখে এককভাবে শিক্ষাকে

গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। কে করবে? এসব নিয়ে ভাবার লোক কোথায়? কেউ চাকরি করার নামে স্বার্থ খোঁজে; কেউবা জনপ্রতিনিধির আলখাল্লা পরে স্বার্থ খোঁজে। সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ দেখা ও ভাবার কে আছেন, ক'জন আছেন?

শুধু জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে এবং জনশক্তি রপ্তানি করে এদেশকে উন্নত ও স্বনির্ভর করা সম্ভব। বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু বিভাগের অনেক ছাত্রছাত্রী পাশ করার এক বছরের মধ্যে বিদেশী বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যায়। কম সংখ্যক ফিরে আসে। বাকিরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে বেশি বেতনে সেখানে কাজ করে, দেশে টাকা পাঠায়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও কেউ কেউ যায়। বাঙালির মেধা খারাপ, একথা নিশ্চয়ই কেউ বলবে না। গলদটা কোথায়? এদেশের প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যদি এমনই হতো যে, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও উন্নত দেশের চাহিদা মতো আমরা প্রাজুয়েট তৈরি করবো, তারা মেধার জোরে বিদেশ যেয়ে বড় বড় পদে কাজ করবে। এমনটি আশা করা কি অতিশয়োক্তি হবে? আমরা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করি রাজনৈতিক কারণে। ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে রামদা-কিরিচের ট্রেইনিং দেয়ার জন্য। নিজেদের দলের লোকগুলোকে সেখানে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়ে রাজনীতির মাঠ দখল করার সুপ্ত অভিপ্রায়ে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইসেন্স দিই রাজনৈতিক বখশিশ বা নজরানা হিসেবে, শিক্ষা-বাণিজ্য করে খাওয়ার জন্য। এদেশে যত বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠেছে, সেখানে যদি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা দেওয়া যেত, এদেশের কোনো কাজে বাইরের দেশের লোকের প্রয়োজন হতো না। আমাদের অনেকেই বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তো; দেশের মর্যাদা বাড়াতো, প্রচুর রেমিট্যান্স পাঠাতো। টাকার অভাব হওয়ার কথা ছিল না। টেকনিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউট থেকে যদি চাহিদা মোতাবেক ব্যবহারিক শিক্ষা ও ভাষা শিক্ষা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে জনশক্তি পাঠানো যেত, ছেলেমেয়েরা অন্তত বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেত। মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে উটের রাখাল হতো না। কিন্তু যত কথাই বলি 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে'? ঘণ্টা বাঁধতে নিশ্চয়ই এই মাস্টারসাহেবকে ডাকা হবে না। কোথায় সে 'বংশীবাদক'? এগুলো করলে যে, দেশে রাজনীতির ব্যবসা আর থাকে না, এটাও তো একটা ভয়।

আমি তো দেখি, মেরে-কেটে উৎসন্ন করে না দিলে এদেশে টাকার অভাব হওয়ার কথা নয়। গত দু-সপ্তাহ আগে আমাদের পাশের গ্রামের এক গরিব যুবকের দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়াতে অনেক দিন ভুগলো। জমিজমা শেষ, গোয়ালের গরু শেষ, হাঁস-মুরগি শেষ, দান-খয়রাত নেওয়া শেষ। শেষে জীবনও শেষ। মৃত্যুর আগ-মুহূর্তে দামি যে শেষ ইনজেকশনটা দেওয়া হলো, সেটার গায়েও লেখা ছিল, '১৫% ভ্যাট সংযুক্ত'। সে মরণের আগ-মুহূর্তেও সরকারকে পরিমাণ মতো ভ্যাট দিয়ে মরেছে। সুতরাং এদেশের সরকারের টাকার অভাব হওয়ার কথা নয়।

'মূল্যস্ফীতির অসহনীয় উর্ধ্বগতিতে বিশিষ্ট ২৪ নাগরিকের উদ্বেগ' খবরটি হালে পানি পাবে বলে মনে হয় না। কারণ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কোনো কান নেই, সে শুনতে পায় না। কেবল মই বেয়ে উপরে উঠতেই জানে। আমাদের কোনো কথা না বাড়িয়ে নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। আমার একটাই বিশ্বাস যে, ক্ষমতাসীন দলই হোক বা বিরোধী দলই হোক– এদেশে কোনো দলের অধীনে নির্বাচন আর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবার সম্ভাবনা নেই। আমরা 'পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে'।

(২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩, যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।